‘হামিদা আলীকে চাই’

লিখেছেন **বদরুল আলম নাবিল**

‘ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ এবং হামিদা আলী এখন সমার্থক। রাজনীতি সংসদে করুন। আমরা বাধা দেব না। এখানে রাজনীতি, দুর্নীতি ও ঘুষ ঢুকতে দেব না।’ আবেগ আপ্লুত হয়ে কথাটা বলেছিলেন অভিভাবক মিসেস আয়েশা খন্দকার। তার ৩ মেয়ে ভিকারুননিসা স্কুলে পড়ছে। তিনি বলছিলেন, ‘যে কোনো প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের শীর্ষে নেয়ার জন্য যোগ্য নেতৃত্ব দরকার। ভিকারুননিসা হামিদা আলীর মতো একজন যোগ্য মানুষের নেতৃত্ব পেয়েছিলো বলেই আজ এটি দেশের অন্যতম শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পেয়েছে। অন্যদিকে এমন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারেনি’।

মিসেস খন্দকারের মতো অনেকেই মনে করেন হামিদা আলীর অবর্তমানে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির পড়া লেখার মান পড়ে যেতে, সুনাম নষ্ট হতে পারে। কারণ হামিদা আলীর যোগ্য রিপ্লেসমেন্ট খুঁজে পাওয়া সত্যি মুশকিল।

অধ্যক্ষা হামিদা আলী ১৯৮১ সালে এ স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। প্রায় শূন্য থেকে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে তুলে আনেন শীর্ষ পর্যায়ে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিতর্ক, বিজ্ঞান চর্চা থেকে শুরু করে পাবলিক পরীক্ষা সর্বত্র ভিকারুননিসার স্থান এখন শীর্ষ পর্যায়ে।

প্রতি বছর পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে এ স্কুল কলেজের ছাত্রীরা ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করে আসছে। শুধু তাই নয়, প্রতিষ্ঠানটি স্কুল থেকে কলেজ এবং পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর হয়েছে। এরকম ধারাবাহিক সাফল্য দেশের আর কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেই। ভিকারুননিসার সব রকম সাফল্যের রূপকার অধ্যক্ষা হামিদা আলী এটা সকলেই স্বীকার করবেন।

আমাদের সমাজে যোগ্য লোকের বড়ই আকাল। হামিদা আলী সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন ভিকারুননিসা স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান হিসেবে তিনি সফল। স্কুল-কলেজ ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক থেকে শুরু করে গভর্নিং বডির সকলেই চান হামিদা আলী অন্তত আরো ২ বছরের জন্য স্বপদে বহাল থাকুন। হামিদা আলী শারীরিকভাবে সুস্থ, তিনি দায়িত্ব পালন করে যেতে চান। কিন্তু রহস্যজনক কারণে সরকার তাকে তার পদ থেকে সরাতে চাচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানটির ৫০ বছরের ইতিহাসে এই

অধ্যক্ষা হামিদা আলী

শেষ পর্যন্ত ছাত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন এভাবে

প্রথম ছাত্রীরা রাস্তায় নেমে এসেছে প্রতিবাদ জানাতে। তারা কয়েকদিন পর্যন্ত সকাল ৮টায় রাস্তায় নেমে আসছে, রাস্তা অবরোধ করে তাদের প্রিয় অধ্যক্ষার অপসারণের প্রতিবাদ জানাতে। খেয়ে না খেয়ে কড়া রোদের মধ্যে বিকেল পর্যন্ত শত শত ছাত্রী সন্ধ্যা পর্যন্ত স্কুলের সামনের রাস্তা শান্তিপূর্ণভাবে অবরোধ করে রাখছে। পুলিশ, সাংবাদিক, বিচারপতি, ব্যবসায়ী আর রাজনীতিক যার গাড়িই আসুক না কেন তারা বিনয়ের সঙ্গে অন্যপথ দিয়ে চলে যাওয়ার অনুরোধ করছে। তাদের অনুরোধের অভিব্যক্তি এতোই করুণ যা কারো পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তারা ঘোষণা দিয়েছে যতোক্ষণ পর্যন্ত সরকার হামিদা আলীর নিয়োগ নবায়ন না করবে তারা ক্লাসে ফিরে যাবে না।

ভিকারুননিসা স্কুলে থমথমে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্রী-অভিভাবক এবং শিক্ষক সকলেই আশঙ্কাগ্রস্ত। কি হতে যাচ্ছে জানে না। স্কুলের ছাত্রীরা এসে হামিদা আলীর পাঁ ছুয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে বলছে, আপা আপনি আমাদের মায়ের মতো, আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না। অবুঝ শিশু কিশোর ছাত্রীদের ভালোবাসা দেখে নির্বাক হামিদা আলীও চোখের পানি ধরে রাখতে পারছেন না। কাউকে কাউকে বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছেন। অনেক ছাত্রীকে দেখা গেছে হাউমাউ করে কাঁদতে।

যেখানে সমস্যার শুরু

অধ্যক্ষা হামিদা আলীর মূল চাকরির মেয়াদ ৬০ বছর শেষ হয়েছে আরো ৫ বছর আগে। তারপর ৩ দফায় আরো ৫ বছর বাড়ানো হয়েছে। বর্ধিত ৫ বছরের মেয়াদ শেষ হয়েছে গত ৮ জুলাই। প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা কমিটি (গভর্নিং বডি) সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা পরবর্তী ২ বছরের জন্য হামিদা আলীকে অধ্যক্ষা পদে বহাল রাখার। সে অনুযায়ী তাদের সিদ্ধান্ত তারা ঢাকা বোর্ড এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে জানিয়েছে। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের সিগনাল পেয়ে ঢাকা বোর্ড জানিয়ে দেয় হামিদা আলীকে পরবর্তী ২ বছরের জন্য স্বপদে বহাল রাখা হবে না।

অনেকেই মনে করছেন বিভিন্ন সময়ে

সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে শীর্ষস্থানীয়দের আবদার-অনুরোধ না রাখার জন্যই হামিদা আলীর চাকরির মেয়াদ বাড়ানোয় সরকার অনুমোদন দিচ্ছে না। বরং একটি মহল উদ্দেশ্যমূলক রাজনৈতিক মোড়ক লাগিয়ে তাকে এবং তার সাফল্যকে অসম্মান করার চেষ্টা করছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য

হামিদা আলীকে নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৪ জুলাই এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে মিসেস হামিদা আলীকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ)-এর চাকরি শর্তাবলী সম্পর্কিত ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ১৯৭৯ সালের রেগুলেশন্স-এর ২৬ ধারা মোতাবেক অবসর দেয়া হয়েছে। রেগুলেশন্সের ২৬ ধারা মোতাবেক ১ জন শিক্ষক ৬০ বছর পর্যন্ত চাকরি করতে পারেন। এর ২৭ ধারার বিধান কিছুটা শিথিল করে আরও ৫ বছর চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির বিধান রাখা হয়েছে।

সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে বোর্ড চেয়ারম্যান ও অধ্যক্ষের ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনের ভিত্তিতেই এই মেয়াদ বৃদ্ধি কার্যকর হয়ে থাকে। হামিদা আলীর চাকরির বয়স ৬০ বছর পূর্ণ হওয়ার পরও তিনি ৩ মেয়াদে (২ বছর+২ বছর+১ বছর) আরো ৫ বছর চাকরি করেন, ৮ জুলাই ০২ তার বয়স ৬৫ পূর্ণ হয়। উল্লিখিত শর্ত ও বিধানের প্রেক্ষিতে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ মিসেস হামিদা আলীর চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করা সম্ভব নয় বলে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ও অধ্যক্ষসহ সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দিয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে ১৩ জুলাই ১ জন সিনিয়র শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে দায়িত্বভার হস্তান্তর করার জন্য গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ও সাবেক অধ্যক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় বোর্ডের অনুরোধ সত্ত্বেও হামিদা আলী বেআইনিভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে দাবি করে সরকারকে নানাভাবে দোষারোপ করছেন। বিজ্ঞপ্তিতে ছাত্রী ভর্তিতে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ করা হয় হামিদা আলীর বিরুদ্ধে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে হামিদা আলী যদি সত্যিই দুর্নীতি বা অনিয়ম করে থাকেন তবে আগেই কেন তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হলো না।

জানা গেছে প্রতিবছর ভর্তির সময়ে সরকারি আমলা এবং মন্ত্রী, এমপিদের বিভিন্ন রকম তদ্বিরের চাপের মুখে পড়তে হয়। তদ্বির সর্ব মহল থেকে এতো বেশি আসে যার কারণে হামিদা আলী কারো তদ্বিরই গ্রাহ্য না করে মেধার ভিত্তিতে ছাত্রী ভর্তি করেন। এ কারণেই তদ্বির করে বিফল আমলা-মন্ত্রীরা ক্ষেপে আছেন হামিদা আলীর ওপরে। তারাই চাচ্ছেন হামিদা আলীকে সরিয়ে এমন একজনকে প্রতিষ্ঠান প্রধান করতে যিনি হবেন তাদের হাতের পুতুল।

ছাত্রীদের মিছিল ঠেকাতে রাস্তায় পুলিশের ব্যারিকেড

অধ্যক্ষা হামিদা আলী উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেছেন, 'একটি প্রতিষ্ঠান চালাতে গেলে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে কী কারণে আমার ওপর কে রুষ্ট হয়েছে তা তিনি জানেন না। তিনি বলেন, আমি রীতিমতো অবাক হয়েছি এবং এটা মেনে নিচ্ছি না। কারণ পরিচালনা পরিষদ আমার মেয়াদকাল বৃদ্ধির ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকার সেটা মেনে নেবে এটাই স্বাভাবিক। বাস্তব পরিস্থিতির বিচারেও এটা সরকারের মেনে নেয়া উচিত।'

মেজর মান্নান পারছেন না

ভিকারুননিসা কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি সরকার দলীয় সাংসদ মেজর মান্নানও চাচ্ছেন হামিদা আলীই থাকুক প্রতিষ্ঠানের প্রধান পদে। তিনি অবরোধকারী ছাত্রীদের কাছে ১৪ জুলাই গিয়ে ওয়াদা করে এসেছেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে তিনি হামিদা আলীকে পরবর্তী ২ বছরের জন্য স্বপদে বহাল রাখার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেও তিনি সুবিধা করতে পারেননি।

একটি মহল প্রধানমন্ত্রীকে বোঝাতে চাইছে হামিদা আলীর সঙ্গে সাবেক আওয়ামী দলীয় সাংসদ ডা. ইকবালের ভালো সম্পর্ক ছিলো। ইকবালের মাধ্যমে তিনি প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নে সাবেক সরকারের সময়ে নানা ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প সরকারের কাছ থেকে এনেছিলেন। তাই সে আওয়ামী ঘেঁষা এটা প্রমাণ করতে চাইছে মহলটি। কিন্তু এ যাবৎ কালে হামিদা আলীকে নিয়ে কোনো রাজনৈতিক বিতর্ক হয়নি। যখন যে সরকার ক্ষমতায় ছিলো নিরপেক্ষভাবে তিনি প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নে সরকারের সহায়তা নিয়েছেন। সাবেক বিএনপি সরকারের সময় (৯১-৯৬) তিনি এই মেজর মান্নানকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করেছেন। তাই মেজর মান্নানও পূর্ণ আস্থা রাখছেন হামিদা আলীর ওপর। কিন্তু একটি মহল রাজনৈতিক রং দিয়ে হামিদা আলীকে সরাতে চাচ্ছে।

শুধু হামিদা আলী নয়, একই প্রক্রিয়ায় তারা সরিয়েছে উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামলী নাসরিন চৌধুরীকে। তিনি প্রথম থেকে উদয়ন স্কুলকে নিজের শ্রম মেধা এবং যোগ্যতা নিঙড়ে দিয়ে একটি ভালো স্কুলে পরিণত করেছেন।

শ্যামলী নাসরিনর চৌধুরী শহীদ ডা.আলিমের স্ত্রী। তিনি ঘাতক দালাল ও মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত। এজন্য অনেকে তাকে আওয়ামীহগার হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়। এই কারনেই তাকে বিদায় নিতে হয়েছে উদায়ন স্কুল থেকে। হামিদা আলীর ক্ষেত্রেও ঘটেছে একই ঘটনা।

অনেকেই আশঙ্কা করছেন হামিদা আলী না থাকলে তার হাতে গড়া এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নষ্ট হয়ে যাবে। হামিদা আলী যেহেতু যোগ্য তাকে নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই, তাই তাকে আরো কিছু দিনের জন্য স্বপদে রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে করছেন অভিজ্ঞ মহল। হামিদা আলীকে সরিয়ে দিলে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে দারুণভাবে। কিন্তু সরকারের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে ভাবমূর্তি বা জনমতের ধার ধারছে না।

ছবি: **এন্ড্রু বিরাজ**

অধ্যক্ষ মুহুরী হত্যাকান্ড

মন্টু গ্রেপ্তার এবং...

সুমি খান, চট্টগ্রাম থেকে

নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপলকৃষ্ণ মুহুরী হত্যাকান্ডের কিলার গ্রুপের সদস্য সিএমপি'র তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী ফটিকছড়ি দক্ষিণ ধর্মপুরের অধিবাসী তসলিম উদ্দিন মন্টু গত ৩ জুলাই বুধবার ভোরে চট্টগ্রামের বাকলিয়া থানার ডিসি রোডের ভাড়া বাসা থেকে গ্রেপ্তার হয়। সিএমপির গোয়েন্দা শাখা একটি চায়নিজ একে-৫৬ রাইফেল, একটি স্প্যানিশ পিস্তল, ২টি ম্যাগাজিন, ২শ' রাউন্ড গুলিসহ কিলার মন্টুকে গ্রেপ্তার করে। এর আগের দিন ভোরে এ মামলার আরেক আসামি শরীফ উদ্দিন মিন্টু গ্রেপ্তার হয়।

শিবির ক্যাডার নাছিরের সহযোগী বর্তমানে ছাত্রদল নেতা মন্টু নিজেকে সাকা চৌধুরী, গিকা চৌধুরী এবং বিমান প্রতিমন্ত্রী মীর নাছিরের 'শিষ্য' বলে দাবি করে। তবে ৩ জুলাই সিএমপি কমিশনারের রুমে সাংবাদিকদের সামনে মন্টু জোর গলায় বলে 'এখন তো আমার বাবাও আমাকে সন্তান হিসেবে স্বীকার করবে না, নেতারা তো বলবেনই না।' তবে অস্বীকার করছে কাশেম চৌধুরীর শিষ্যত্ব।

তসলিম উদ্দিন মন্টু

৭ দিনের রিমান্ড শেষে মন্টু ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেয়। মন্টু গত ১১ জুলাই বৃহস্পতিবার মহানগর হাকিম আতাহার আলীর আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে বলে, অধ্যক্ষ মুহুরীকে হত্যার নির্দেশদাতা নাছির, পরিকল্পনা আরেক শিবির ক্যাডার নগরীর শীর্ষ সন্ত্রাসী হাবিব খানের। অধ্যক্ষ মুহুরীর মাথায় একে-৫৬ রাইফেল ঠেকিয়ে গুলি করেছিলো নাছির গ্রুপের ক্যাডার গিট্টু নাছির। কিলিং স্কোয়াডে ছিল মন্টুসহ ছোট সাইফুল, আলমগীর ও আজম।

মন্টুর মতে শিবির ক্যাডার নাছির তার ছোট ভাই নাজিম এবং চাচাতো ভাই মমতাজ হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যই কারাগারের ভেতর থেকে এ নির্দেশ দেয়।

গত ২ অক্টোবরের সংসদ নির্বাচনের পর ৪ দলীয় জোট ক্ষমতায় গেলে নাছির এ নির্দেশ দেয় প্রতিশোধ মেটাতে পারবে বলে। ১০ নবেম্বর নাছিরের ছোট ভাই মহিউদ্দিন শিবির ক্যাডার হাবিব খান ও তসলিম উদ্দিন মন্টুর সঙ্গে দেখা করে নাছিরের নির্দেশ পৌঁছে দেয়। হাবিব খান ফটিকছড়ির আজম, বালুছড়ার ছোট সাইফুল, হাটহাজারীর গিট্টু নাছির ও মন্টুকে নিয়ে ফটিকছড়ির পাহাড়ে শলাপরামর্শ করে ক্যাডারদের স্ব স্ব দায়িত্ব দিয়ে দেয়।

১৪ নবেম্বর হাবিব খান জামালখানে অধ্যক্ষ মুহুরীর বাসার সব কিছু দেখে ১৫ নবেম্বর রাতে আবার কিলারদের নিয়ে বসে অপারেশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে– গিট্টু নাছির গুলি করবে, আজম, মন্টু, আলমগীর পাহারা দেবে। ছোট সাইফুল রাস্তায় গাড়ির দিকে নজর রাখবে। ১৬ নবেম্বর সকাল সাতটায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী চট্টগ্রামে ছিলেন। এ সময়েই কিলার গ্রুপটি মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরীকে ঘুম থেকে ডেকে মশারি থেকে বের করে ড্রইং রুমের সোফায় বসিয়ে মাথায় একে-৫৬ রাইফেল ঠেকিয়ে হত্যা করে স্পর্ধিত পায়ে ট্যাক্সিতে উঠে পালিয়ে যায়।

ক'দিন আগে সিএমএম মোঃ নূরনবী নাছিরের ৭ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করলে নাছিরের আইনজীবীদের আবেদনে তা বাতিল করেন আবার। গত ১৩ জুলাই শনিবার পৌনে তিনটায় ১১ জুলাইয়ের আদালতের নির্দেশ মতো সিএমপি'র ডিবি অফিসে নাছিরকে আনা হলে সাদা ধবধবে ফতুয়া গায়ে বেশ খোশ মেজাজেই দেখা যায় তাকে। অথচ কারা চিকিৎসক লিখেছেন 'অসুস্থতার কারণে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারে না নাছির।'

৩৬ মামলার আসামি নাছিরের বিরুদ্ধে অধিকাংশ মামলাতেই হয় জামিনপ্রাপ্ত, নয় চূড়ান্ত রিপোর্ট হয়ে গেছে। পুলিশ কর্মকর্তারাও কারা চিকিৎসকের রিপোর্ট নিয়ে সন্দেহ পোষণ করছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়।

উল্লেখ্য মন্টু '৯৭ সালে ৮টি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ও ২৬০০ রাউন্ড গুলিসহ গ্রেপ্তার হয়। তখন মানিক মিয়া পরিচয় দেয় মন্টু। এছাড়া রাউজান থানায় তার নামে মামলা আছে- সেখানে তার নাম আবুল খায়ের মঞ্জু, তার দাদার নাম আবুল খায়ের যা সে অনেক সময় ব্যবহার করেছে।

দুর্ধর্ষ কিলার মন্টু বিভিন্ন সময়ের হত্যা, অপহরণের কথা স্বীকার করলেও মুহুরী হত্যা প্রসঙ্গে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছে। তবে নির্বাচনের সময় থেকে সে সক্রিয় ছাত্রদল কর্মী বলেও দাবি করে।

এদিকে ফটিকছড়ির কাশেম চেয়ারম্যানের সকল অপকর্মের প্রধান সহযোগী মন্টু সুকৌশলে কাশেম চেয়ারম্যানের নাম এড়িয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে গত ৫ জুলাই রাত ৯টায় কাশেম চেয়ারম্যান তার বাড়ি কাঞ্চননগরের নিরাপদ আস্তানায় আশ্রয় নিয়েছে–মন্টু গ্রেপ্তারের পর। ৮ম সংসদ নির্বাচনের ৩ দিন আগে জামিনে বের হয়ে আসে মন্টু। এর পেছনে নজিবুল বশর ভান্ডারি এবং কাশেম চৌধুরীর তৎপরতা ছিল বলে জানা যায়। নির্বাচনের সময় থেকে এ পর্যন্ত অসংখ্য হত্যা, অপহরণ এবং বিভিন্ন ঘটনায় মন্টুর সংশ্লিষ্টতা দাবি করছে পুলিশ।

এ প্রসঙ্গে সিএমপি কমিশনার শহীদুল্লাহ খান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'মুহুরী হত্যা মামলার আসামি তসলিমউদ্দিন মন্টু ধরা পড়েছে। যদিও সে এ ঘটনার সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করছে আমরা প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করছি। আশা করছি এ মামলায় কিলার হিসেবে অভিযুক্ত গিট্টু নাছির, হাবিব খানকেও গ্রেপ্তারে সক্ষম হবো আমরা।'

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রবল চাপে সিএমপি মন্টুকে গ্রেপ্তারে বাধ্য হয়েছে– এমন মন্তব্যও করেন ইন্টারোগেশন সেলের প্রভাবশালী কর্মকর্তা। নয়তো নগরীতে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়ানো শীর্ষ সন্ত্রাসী মন্টু হঠাৎ গ্রেপ্তার হবে–

এমন ধারণা তার ছিল না। তবে মন্টু প্রকাশ্যে সাংবাদিকদের বলে, তার প্রতিপক্ষ হামলা করবে বলেই অত্যাধুনিক স্প্যানিশ Astra পিস্তল, একে-৫৬ এবং বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ সঙ্গে রাখতো।

মন্টুর দেয়া তথ্য মতে, তার সঙ্গে জড়িত ছিল তার প্রতিবেশী ছাত্রদল নেতা মহসিন। মহসিনের বাড়িতে মার্শাল ব্যাগে পাওয়া যায় মন্টুর একে-৫৬ রাইফেল। মহসিন পলাতক হলেও তাকে গ্রেপ্তারে বাধ্য করতে পুলিশ মহসিনের দুই ভাই জসিম উদ্দিন ও বেলাল হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে।

নাজিরহাট কলেজের দুর্নীতির দায়ে চাকরিচ্যুত হিসাবরক্ষক শাহজাহানের ভাগ্নে মিন্টু পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে অধ্যক্ষ মুহুরী হত্যার আগের দিন মুহুরীর বাসায় গিয়ে তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে। পুলিশ জানায়, এ হত্যাকান্ডের সঙ্গে (বর্তমানে জামিনে) তিন শিক্ষক, মন্টু, মিন্টু এবং স্থানীয় কিছু লোকের জড়িত থাকবার নিশ্চিত প্রমাণ তাদের হাতে রয়েছে।

সন্ত্রাসীদের সঙ্গে উদ্ধারকৃত গুলিতে BOF লেখা থাকে অনেক সময়। গত ৩ জুলাই ছাত্রদল ক্যাডার তসলিম উদ্দিন মন্টুর কাছ থেকে ১৫৯ রাউন্ড গুলি পাওয়া যায়। তার মধ্যে ৮২ রাউন্ড গুলিতে BOF বা বাংলাদেশ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির ছাপ। উল্লেখ্য, নিটোল হত্যা মামলায় গ্রেপ্তারকালে সাকা চৌধুরীর বাসা থেকে উদ্ধারকৃত গুলির মধ্যে POF বা পাকিস্তান অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির ছাপ ছিল। এ প্রসঙ্গে গত সেপ্টেম্বরে সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে সাক্ষাতে সাকা চৌধুরী বলেছিলেন, 'আমার বাড়িতে পাওয়া গুলিতে BOF বাংলাদেশ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি লেখা, সেটা কীভাবে এলো? একমাত্র পুলিশই পারে এর জবাব দিতে।' যথারীতি নিজেকে দোষী-নির্দোষ কোনোটিই দাবি করেননি। দায় চাপিয়েছেন অন্যের ওপর। তবু প্রশ্ন আসে অবলীলায় বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর গুলি এতো অনায়াসলভ্য হয় কী করে?

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গত ২২ জুনের নির্দেশক্রমে চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলাসমূহ চিহ্নিত করে দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জেলা প্রশাসককে চেয়ারম্যান করে গঠিত হয়েছে মনিটরিং সেল। ভারতীয় পুলিশের আইজি, পুত্র জিবরান তায়েবী হত্যাকান্ড, বহদ্দারহাটের এইট মার্ডার, অধ্যক্ষ মুক্তিযোদ্ধা গোপালকৃষ্ণ মুহুরী হত্যা রাউজানের বৌদ্ধভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি হত্যাকান্ড ও সমাজসেবা কর্মকর্তা বকুল রানী হত্যাকান্ডকে প্রাধান্য দিয়ে প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু হয়েছে বলে সূত্রে প্রকাশ। নিহতদের স্বজনদের প্রতীক্ষার প্রহর হয়তো ফুরাবে দ্রুত নিষ্পত্তির তৎপরতা অব্যাহত থাকলে।

প্রতিক্রিয়া

একুশে টেলিভিশন কেন বন্ধ হবে

গত ১২ জুলাই ২০০২ তারিখে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রচ্ছদ কাহিনী 'একটি স্বপ্নের মৃত্যু' আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে।

আমি একজন বয়সে প্রবীণ অবসরপ্রাপ্ত লোক। জীবনের শেষ বেলায় এসে এ হাহাকারের দেশে অন্তত একটি আশায় বুক বেঁধেছিলাম একুশে টেলিভিশনের বুদ্ধিদীপ্ত কার্যক্রম দেখে।

একুশে টেলিভিশন আমাদের কি দিয়েছে?

(১) গণমাধ্যম সমাজের আয়না তা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ করেছে।

(২) গণমাধ্যম একটি সুন্দর সমাজ গঠনে পথ-প্রদর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে তা' প্রতিষ্ঠিত করেছে।

(৩) সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতায় নিরপেক্ষতায়, পরমুখাপেক্ষিতা কাটিয়েছে।

(৪) গণমাধ্যম ভীষণভাবে গণমানুষের কত ঘনিষ্ঠ হতে পারে তা প্রমাণ করেছে।

একুশে টেলিভিশন তার নিরপেক্ষ সংবাদ, জনপ্রিয় অনুষ্ঠান দেশ জুড়ে কিংবা সমাজের অবহেলিত অনাদৃত বাউল শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান করে প্রমাণ করেছ সে 'ভয়েজ অব বাংলাদেশ' কিংবা 'ভয়েজ অব গণমানুষ'।

একুশে টেলিভিশনের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান সংবাদ। সংবাদ পরিবেশনায় সাহসী নিরপেক্ষ ভূমিকা দেশের আপামর এবং আবালবৃদ্ধবণিতাকে সংবাদমুখী করেছে– এটা একটি সুন্দর এবং সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য যুগান্তকারী ভূমিকা। আগে ৬৮ হাজার গ্রামের বাংলাদেশে রাত শুরু হতো ৮টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আর এখন বাংলাদেশে রাত শুরু হয় একুশে রাতের সংবাদের পর অর্থাৎ ১১টার সংবাদের পর।

দেশজুড়ে অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে দেশের প্রতিটি মানুষ বুক ফুলিয়ে বলতে পারবে 'আমি আমার দেশকে দেখেছি, মানুষকে দেখেছি।'

আমাদের বাংলাদেশ কত যে বৈচিত্র্যময়, রূপ-রস-গন্ধময় মানুষ এটা দেখেছে স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পর নয়, এই ভূখণ্ড সৃষ্টি হওয়ার পর এই প্রথম, যা সম্ভব করেছে একুশে টেলিভিশন। একটি সমাজ সুন্দর হয় সেই সমাজে বসবাসরত মানুষের সুস্থ চিন্তা বোধ বুদ্ধি থেকে। একুশে টেলিভিশন সেই পরিবর্তন শুরু করেছিলো সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল দায়বদ্ধতা থেকে। পৃথিবীর সব উন্নত দেশে, সব সুশীল সমাজে আগামী প্রজন্মের প্রতি যত্নশীল থাকে যার ফলশ্রুতিতে দেখা যায় সেই সমাজের, দেশের নেতৃত্ব সুসংহত হয়। আমাদের এই টানাপড়েনের দেশে আগামী প্রজন্মকে একটি পথ, স্বপ্ন দেখিয়েছিলো একুশে টেলিভিশন 'বলতে চাই' মুক্ত খবরের মতো সুন্দর অনুষ্ঠান করে।

আমাদের ছোট ছোট সন্তানেরা তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় আলোচনা অথবা ঘটনা সামনে তুলে ধরে পুরো সমাজের বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছে। হতে পারে একজন পর্দায় উপস্থাপিত হয়েছে কিন্তু এর ফলাফল সারা দেশের নতুন প্রজন্মের কাছে উদাহরণ হয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পাথেয় হিসেবে করেছে। যা এই বৃদ্ধ বয়সে আমি আমার সন্তানের জন্য পারিনি কিন্তু একুশে টেলিভিশনের এই কিশোর-কিশোরীদের অনুষ্ঠান আমার নাতী-নাতনীদের জন্য করেছে। এসব কিশোর-কিশোরীদের কর্মতৎপরতা দেখে নিজেকে অক্ষম অথবা পিছিয়ে পড়া মানুষ মনে হলেও আমাকে প্রচণ্ডভাবে নতুন প্রজন্মের প্রতি আশাবাদী করে তোলে।

সমাজের আনাচে-কানাছে লুকিয়ে থাকা প্রতিভা খুঁজে বের করা কিংবা অবহেলিত অনাদৃত বাউলদের শুধু দেশেই নয়–বিদেশেও এই মহৎ কাজটি করেছে একুশে টেলিভিশন।

একুশে টেলিভিশনের বয়স ৩ বছরও হয়নি কিন্তু এর জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। একুশে টেলিভিশনের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে এই সমাজের যা কিছু সুন্দর, ভালো তাই মানুষের কাছে গ্রহণীয়।

আমার ঘরে যে টেলিভিশন সেটটি আছে আগে এটাকে মনে হতো বিজাতীয় সংস্কৃতি ছড়ানোর যন্ত্র। একুশে চালু হওয়ার পর সেই টেলিভিশন সেটটিকেই মনে হয় মানুষের বন্ধু, সমাজের বন্ধু। আমাদের ঘরে যে কয়টি জানালা আছে সেই জানালা দিয়ে আমরা বাইরের দৃশ্য দেখি, আকাশ দেখি। সেই রকম একুশে টেলিভিশন চালু হওয়ার পর টিভি সেটটিকে মনে হয় ঘরের আরেকটি জানালা। সেই জানালা দিয়ে আমার ভাষায় আমার দেশকে দেখি, গোটা বিশ্বকে দেখি।

কিন্তু যখনই শুনি একুশে টেলিভিশন বন্ধ হয়ে যাবে, মনে হয় আমরা অন্ধকারের দিকে যাচ্ছি।

মুক্তবুদ্ধির কথা, জ্ঞানের কথা বলার জন্য সক্রেটিসকে বিষপান করিয়ে হত্যা করে মারা হয়েছিলো। আজ একুশে টেলিভিশন বন্ধ করার তৎপরতা দেখে মনে হচ্ছে মুক্তবুদ্ধিকে, সুন্দরের চর্চাকে হত্যা করা হচ্ছে। তার অর্থ কি এই নয়, আমরা সক্রেটিসের সময় থেকে একচুল পরিমাণ অগ্রসর হতে পারিনি? তাহলে আমাদের সমাজ, দেশ কিভাবে সামনের দিকে যাবে?

মোঃ মঈনুদ্দিন মৃধা, ময়মনসিংহ

ইকবালের হলুদ বাহিনী গেলো কোথায়!

রিপোর্ট **প্রশান্ত মজুমদার শান্ত**

২০০১ সালের জানুয়ারি মাস। তেজগাঁও-রমনা এলাকা। ঢাকা-১০ আসনের ৯টি ওয়ার্ডে শুরু হলো একটি নতুন দিনের। মহানগরীর এ থানাদ্বয়ের অধিবাসীরা দরজার কাছে শুনতে পেল অন্যরকম একটি ধ্বনি। বাঁশির হুঁইসেল। দরজা খুলে দেখতে পেল হলুদ পোশাক পরিহিত এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। উদ্দেশ্য, বাসাবাড়ির নিত্যদিনের ময়লা সংগ্রহ করা। শতাধিক লোক নিযুক্ত হলো এ কাজে। তারা থানা দু'টির (নাখালপাড়া থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত) বিভিন্ন বাসা, কলোনি, স্টাফ কোয়ার্টার থেকে বিনামূল্যে ময়লা সংগ্রহ করে সিটি কর্পোরেশনের ডাস্টবিনগুলোতে ফেলে দেয়। নিয়মিত এ কাজ চলতে থাকায় ঢাকাবাসীর নজর এড়ায়নি। মনের অজান্তেই বহুল আলোচিত তিন খুনের ঘটনা, মালিবাগের মিছিলে যে সাংসদের উপস্থিতিতে ঘটেছিল সেই ডা. এইচবিএম ইকবালকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারেননি। কিন্তু এরা পেছনে যে শুধু নিজেকে প্রচার, পরিচিত ও রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করাই মূল উদ্দেশ্য ছিলো সেটি বুঝতে মহানগরবাসীকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হলো না। ১ অক্টোবরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হেরে হারিয়ে গেলো তার সামাজিক আন্দোলনের বিনামূল্যে ময়লা সংগ্রহের হলুদ বাহিনী। বর্তমানে অনুসন্ধান করে এমন তথ্যই পাওয়া গেছে।

নির্বাচনের আগে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে পত্রিকায় হলুদ বাহিনীর বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। কিন্তু নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর তারা কোথায়?

সেই সময়ের নয় মাস

২০০১-এর জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর। তেজগাঁও-রমনা এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে গতি এসেছিল। ফুটপাত, অলিগলিগুলো পরিচ্ছন্ন ছিলো। ঝাড়ুদারেরা নিয়মিত ঝাড় দিতো। সিটি কর্পোরেশনের গাড়িগুলো প্রতিদিন এসে ডাস্টবিনগুলো থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে নিয়ে যেতো। প্রাক্তন সাংসদ ডা. এইচবিএম ইকবালের নজর ছিলো এদিকে। তিনি নিজের গাঁটের টাকা খরচ করে একটি বাহিনী গড়ে তুলেছেন। হলুদ পোশাক পরিহিত সেবাকর্মী নামে পরিচিত এ বাহিনীর কাজ ছিলো বাসা থেকে ময়লা সংগ্রহ করে ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া। সাবেক ওয়ার্ড কমিশনারগণও ছিলেন তৎপর। এলাকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে তারা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলেন। উক্ত এলাকার বাসিন্দারাও মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন এই কার্যক্রমকে। এলাকার বিভিন্ন দল ও সংগঠনের মধ্যে রেষারেষি থাকলে এ নিয়ে তাদের মাঝে দ্বন্দ্ব ছিলো না। দলমত নির্বিশেষে সামাজিক আন্দোলনের এই কার্যক্রমকে স্বাগত জানিয়েছিলেন সকলে। ঢাকাকে সুন্দর রাখতে এ ধরনের উদ্যোগের গুরুত্ব থাকায় প্রাক্তন সাংসদ এজন্য কমিউনিকেয়ার পরিবেশ পদক লাভ করেছিলেন। ঢাবির জগন্নাথ হলে এ বাহিনীর হয়ে কাজ করছেন তকদির, মনা, গাজী ও সুকুমার। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত বছর নয় মাস কাজ করছেন। তাদের কর্মী সংখ্যা ছিলো একশ'জন। ময়লা সংগ্রহের জন্য ভ্যানগাড়ি ছিলো ৫০টি। প্রতিটি গাড়িতে দু'জন এবং প্রতিটি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ১০ জন কর্মী কাজ করতো। প্রতিজন কর্মী মাসিক ১৬০০ টাকা বেতন পেত, যদিও সাবেক সাংসদ এজন্যে ২০০০ টাকা প্রদান করতেন। বাসাবাড়িগুলো থেকে প্রতিদিন এক বার করে তারা ময়লা সংগ্রহ করে ডাস্টবিনে ফেলে দিতো।

পরিপাটি চেহারাটি আজ নেই

ঢাকা ১০-এর তেজগাঁও-রমনা এলাকার পরিপাটি চেহারাটি আজ আর নেই। ডা. ইকবালের সেবাকর্মীগণ বিভিন্ন ধরনের বাসাবাড়ি থেকে ময়লা সংগ্রহ করে যথাযথভাবে ডাস্টবিনের ভেতরে ফেলতো। কিন্তু বর্তমানে দেখা গেছে, ডাস্টবিনগুলোর দু'পাশে ৫-১০ গজ পর্যন্ত ময়লা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। বর্তমানে সিটি কর্পোরেশনের গাড়িগুলো দুই-তিন দিন পর এক বার এসে ময়লা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। কিন্তু ডাস্টবিনগুলোর আশপাশের ময়লা পড়ে থাকছে দিনের পর দিন। ফুটপাত, অলিগলিগুলোও অপরিচ্ছন্ন। স্থানীয় বাসিন্দারা কেউ কেউ ডাস্টবিনে ময়লা না ফেলে নিজেরাই বানিয়ে ফেলেছে সেমি ডাস্টবিন। কোনো কোনো পাড়ায় স্থানীয় উদ্যোগে বাসাবাড়ির ময়লা সংগ্রহ করা হচ্ছে। এ জন্যে প্রতি পরিবারকে প্রদান করতে হচ্ছে মাসিক ১০ থেকে ২৫ টাকা। ঢাবির গিয়াস উদ্দিন কলোনির একজন গৃহিণী বলেন, 'উদ্যোগটি ভালো ছিল। আমাদের উপকার হতো। কাজের ছেলেটা এক দিন ময়লা ফেলতে দেরি করলে সেটা বিরক্তিকর হয়ে ওঠে।' নাখালপাড়ায় একজন গার্মেন্টস কর্মী বলেন, 'আমি নিজেই ময়লা ফেলি। আর ইকবাল স্যারতো ক্ষমতায় নাই, তাই আমাগো কাজ করবে কেন?' তেজকুনীপাড়ার একজন ব্যবসায়ী বলেন, 'এ ধরনের উদ্যোগে খুবই ভালো। আমরা চাই রাজনীতিবিদরা এলাকার মানুষের জন্য কিছু করুক। শুধু নির্বাচনে জয়ী হলে এলাকার কাজ করতে হবে, পরাজিত হলে কিছু করা যাবে না এমন তো কোনো কথা নেই।

ডা. ইকবাল : কথা বলতে নারাজ

গত ১ সপ্তাহ যাবৎ চেষ্টা করেও ডা. ইকবালের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। বনানীতে ইকবাল টাওয়ারে গিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি। তার পিএস জনাব নাজমুল সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'স্যারের যথেষ্ট ইচ্ছা ছিলো কার্যক্রমটিকে চালু রাখা। কিন্তু গত ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর প্রতিটি পাড়ায় স্থানীয় বিএনপি'র নেতা-কর্মীরা জনকল্যাণমূলক এই সামাজিক কার্যক্রমটিকে চালাতে বাধা দেয়, হুমকি দেয়। এক পর্যায়ে আমরা কার্যক্রমটিকে বন্ধ করতে বাধ্য হই। আমাদের কার্যক্রম চলে দেড় বছর।' কিন্তু উক্ত বাহিনীর কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তারা কাজ করেছেন নয় মাস। বেতন পেয়েছেন ১০ মাসের। তারা আরো জানায়, ১ অক্টোবরের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে অক্টোবর মাস থেকে তাদের কাজ থাকবে না। তেজকুনীপাড়ার এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলেও জানা গেছে সেখানে বিএনপি'র কর্মীরা এ কাজে বাধা দেয়নি। এমনকি ৫৭ নং ওয়ার্ডে দায়িত্বপ্রাপ্ত

মগের মুল্লুক

১২ মাসই কি থাকবে গ্রীন রোডের এই অবস্থা

পান্থপথে রিকশা চলাচল বন্ধ। স্বাভাবিকভাবেই ট্রাফিক বেড়ে গিয়েছে গ্রীন রোডে। কোথায় সরকার এই রাস্তায় জ্যাম নিয়ন্ত্রণে রাখবে, তা না করে সরকারের কোন না কোন বিভাগ ১২ মাসই এই রাস্তাটি খোড়াখুড়িতে ব্যস্ত থাকে। আর বর্ষা আসলেই এই কাজের ধুম পড়ে যায়। সিটি কর্পোরেশন বলে, 'সমন্বয়হীনতার অভাব'। প্রশ্ন হচ্ছে, তাদের এই তথাকথিত সমন্বয়হীনতার জন্য সাধারণ মানুষ আর কতকাল ভুক্তভোগী হবে?

ঢাবির শিক্ষা অফিসার বজলুর রহমান মিঞা সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'যেহেতু ওনার সরকার ক্ষমতায় নেই। তাই মাসে ২ লাখ টাকা কেন খরচ করতে যাবেন?'

উদ্যোগটি চালু রাখার প্রয়োজন ছিলো

ঢাকার রমনা থানার ৫৭ নং ওয়ার্ডে কাজ করেছে ১০ জন সেবাকর্মী। এর দায়িত্বে ছিলেন ঢাবি সেকশন অফিসার বজলুর রহমান মিঞা। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'উদ্যোগটি চালু রাখার প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু ওনারা (রাজনীতিবিদরা) স্বার্থের জন্য টোপ ফেলেন। আর যেহেতু ওনার সরকার ক্ষমতায় নাই । মাসে ২ লাখ টাকা খরচ করে এলাকাবাসীর উপকার করলে নাম হবে বিএনপি'র। ৩৯ নং ওয়ার্ড কমিশনার তেজকুনীপাড়ায় শামীম হাসানের বাসায় আব্দুল হাই নামে তার এক ঘনিষ্ঠ লোক সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'ডা. ইকবালের কয়েকটা গাড়ি এখানের একটি ক্লাবে জমা আছে। বর্তমানে শামীম ভাইয়ের উদ্যোগে এ কাজটি চলছে। তার বাসা থেকে বের হতে দেখা গেলো ভাঙা-জীর্ণ একটি ভ্যান গাড়িতে ২ জন লোক ময়লা নিতে আসছে। তারা জানালো এ কাজ করে প্রতিটি পরিবার থেকে ১০ টাকা করে পায়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। এ ধরনের একটি সামাজিক আন্দোলন যা পরিবেশ রক্ষায় সহায়ক। মানুষের উপকারে আসে। রমনা-তেজগাঁওবাসী এ ধরনের শুভ উদ্যোগটি আবারও কামনা করছেন। ডা. ইকবাল বিজ্ঞাপন দিয়ে লাখ লাখ টাকা খরচ করছেন উদ্যোগটির সাফল্যকে প্রচার করতে। কিন্তু তার স্বউদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বর্জ্য ও ময়লা সংগ্রহের হলুদ বাহিনীকে আবার দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

'সাপ্তাহিক ২০০০' ছাত্ররাজনীতি বিষয়ক জরিপ ফরম

নাম ..... **পেশা** .....

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ..... **ঠিকানা** .....

১। ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে জড়িত -	ক. হ্যাঁ ☐ খ. না ☐
২। বুয়েটের ছাত্ররাজনীতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি -	ক. ভালো ☐ খ. মোটামুটি ☐ গ. খুব খারাপ ☐
৩। বুয়েটে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন -	ক. পক্ষে ☐ খ. বিপক্ষে ☐
৪। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দিলে -	ক. ইতিবাচক প্রভাব পড়বে ☐ খ. নেতিবাচক প্রভাব পড়বে ☐
৫। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করলেই -	ক. ক্যাম্পাস সন্ত্রাসমুক্ত হবে ☐ খ. হবে না ☐
৬। মূল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা না রেখে, ছাত্র নেতারা যদি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সে রকম ছাত্র রাজনীতি -	ক. চান ☐ খ. চান না ☐ গ. ছাত্র রাজনীতির কোনো প্রয়োজন নেই ☐

আমরা জরিপ করেছি। জরিপে যে ফলাফল এসেছে সেটাই উল্লেখ করেছি রিপোর্টে। তবে এ বিষয়ে আমরা আপনার মতামত চাই। ওপরের অংশটি পূরণ করে কেটে পাঠান। পরবর্তীতে আমরা আপনাদের পাঠানো মতামতের ওপর তৈরি ফলাফল পত্রিকায় রিপোর্ট আকারে প্রকাশ করবো। বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিক অংশগ্রহণ করতে পারবে।

পাঠানোর শেষ তারিখ : **১৫ আগস্ট, ২০০২২২**

পাঠাবার ঠিকানা : **ছাত্ররাজনীতি বিষয়ক জরিপ**
সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

বুড়িগঙ্গা রক্ষায়

সমাবেশ ও নৌকা মিছিল

নগর সভ্যতার নামে যেভাবে চলছে জলাভূমি গ্রাস। এতে ভারসাম্য হারাচ্ছে প্রকৃতি। এ বিষয়ে সরকারের নেই কোন মাথা ব্যথা। অথচ পরিবেশ সচেতন অনেক নাগরিকই এগিয়ে এসেছেন প্রতিবাদ জানাতে। এ নিয়ে লিখেছেন রুহুল তাপস

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) সহসভাপতি অধ্যাপক আবু সায়ীদ বক্তব্য রাখছেন

'খুকু ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গি এলো দেশে/বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিবো কিসে।' একটা সময় ছিলো মায়েরা শিশুদের ঘুম পাড়ানোর জন্য গাইতেন এই ছড়া গানটি। এই ছড়াগানটির প্রেক্ষাপট ছিলো ব্রিটিশ শোষণের নীরব প্রতিবাদ। ব্রিটিশ শোষণের অবসান ঘটেছে প্রায় ২৫০ বছর। অথচ এখনও বর্গিরা হানা দেয়। তবে সেই বর্গিরা ভিনদেশী নয়, দেশী। তাদের নজর খাস জমির এবং প্রকৃতির ওপর। কখনও তারা নদীর দু'পাশ দখল করে নিতে হানা দেয়। আবার কখনও বা বড় বড় গাছের দিকে। ঢাকার প্রাণ বুড়িগঙ্গা নদীর পাড় দখল করে আসছে এসব বর্গিরা দীর্ঘদিন ধরে। এতে হারাতে বসেছে বুড়িগঙ্গা। সম্প্রতি ঢাকার সী বিচ নামে পরিচিত আশুলিয়ার প্রায় পাঁচ হাজার একর জমি দখল করে নিয়েছে যমুনা গ্রুপ। এই জমি দখল করে তথাকথিত নিউ উত্তরা মডেল টাউন নামে উপশহর গড়ে তোলার জন্য জলাভূমি ভরাট করছে। যেভাবে জলাভূমি গ্রাস চলছে নগর সভ্যতার নামে, এতে ভারসাম্য হারাচ্ছে প্রকৃতি বলে চিহ্নিত করেছেন পরিবেশ সচেতন ব্যক্তিরা। অথচ এদিকে সরকার ও বিরোধী দলের রাজনীতিবিদদের নেই ভ্রূক্ষেপ। তারা শুধু ব্যস্ত সিংহাসন যুদ্ধে আর নিজের সম্পদের পাল্লা ভারী করতে। ঢাকার প্রাণ বুড়িগঙ্গার দু'পাশের প্রায় সাড়ে চার হাজার একর জমি বেদখল হয়ে গেছে। এসব জমির দখলদার প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং শিল্পপতিরা। তাদের নজর শুধু পরিত্যক্ত খাস জমির দিকে। রাজউক কয়েক দফা উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েও সফল হতে পারেনি। কিছুদিন পর আবারও দখলদার দখল করে নিয়েছে এসব জায়গা। সরকারের এসব নিয়ে মাথা ব্যথা না থাকলেও দেশের পরিবেশ সচেতন নাগরিকরা ঠিকই এগিয়ে এসেছেন। তারা এক হয়ে গঠন করেছেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)। বুড়িগঙ্গা নদীর উভয় পাশের সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদসহ এই নদীকে দখল-দূষণমুক্ত করতে বাপা গত ১২ জুলাই নাগরিক সমাবেশ ও নৌকা মিছিলের আয়োজন করে। তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার মানুষ এগিয়ে আসেন বুড়িগঙ্গাকে রক্ষার জন্য। রাজনীতিকরা যখন মিছিল-মিটিং করতে টাকা দিয়ে ভাড়া করেও লোক পান না, ঠিক এ সময় পরিবেশ সচেতন নাগরিকদের ডাকে নিঃস্বার্থভাবে ছুটে আসেন হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। এসব মানুষ সমাবেশে মিলিত হন সদরঘাট এলাকায়। সমাবেশে বক্তারা আহ্বান জানান, বুড়িগঙ্গার উভয় তীরের অবৈধ দখল ও স্থাপনা উচ্ছেদসহ নদীকে দূষণ ও দখলমুক্ত করার। এছাড়াও সমাবেশে স্থানীয় জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে ঘোষণা দেয়া হয় 'বুড়িগঙ্গা বাঁচাও' আন্দোলনকে ক্রমান্বয়ে কঠোরতম করার।

নৌকা মিছিলের একটি দৃশ্য

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের সভাপতিত্বে এ সমাবেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) সহসভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, 'একদিন ঢাকা মহানগরী ছিলো না, কিন্তু বুড়িগঙ্গা ছিলো। এই নদীর প্রাণধারা আহরণ করে গড়ে উঠেছে মহানগরী। বুড়িগঙ্গা তাই ঢাকা মহানগরীর মায়ের মতো। বুড়িগঙ্গার সকল অবৈধ দখল ও দূষণ প্রতিরোধ করতে সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।' অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, 'এক সময় বুড়িগঙ্গা আন্দোলন ছিলো একটি প্রচেষ্টা। আজ তা সব ধরনের ব্যক্তি ও সংগঠনের সমবেত প্রচেষ্টায় একটি আন্দোলনের রূপলাভ করেছে। যার ফসল বুঝতে পেরেছে ঢাকাবাসী।' সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন সাবেক অর্থমন্ত্রী এমএ মুহিত, বাপার সাধারণ সম্পাদক আবু নাসের খান, বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলনের সদস্য সচিব মিহির বিশ্বাস, ঢাবির অধ্যাপক সালাউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা শাজাহান মৃধা, প্রশিকার এজে বড়াল, আমিরুল ইসলাম, ড. মাহবুবুর রহমান, ঘাট শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আবদুস সালাম প্রমুখ।

সমাবেশে সাধারণ নগরবাসী 'বুড়িগঙ্গা দখল রুখতে হবে', 'নদী দূষণ বন্ধ কর' প্রভৃতি স্লোগান লিখিত ফেস্টুন, ব্যানার, প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করেন। বাপার উদ্যোগে সমাবেশের পরপর বের হয় নৌকা মিছিল। এই নৌকা মিছিলে অংশ নেয় প্রায় এক হাজার নৌকা। নৌকা মিছিল সদরঘাট থেকে জিঞ্জিরা সেতুস্থল ঘুরে আবার ফিরে আসে সদরঘাটে। নৌকা মিছিল ছাড়াও বিভিন্ন সংস্কৃতি সংগঠন পরিবেশ বিষয়ক গান ও নাটক পরিবেশন করেন।